কথোপকথন

অনন্ত

ইমেইল : ananta_atheist@yahoo.com

****

(১)

কিছুদিন ধরেই মাথার মধ্যে বেশ কিছু প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্তু উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না। কানের ভিতর পোকা ঢুকলে যেমন বের না করা পর্যন্ত কানে কটকট লাগে, সবসময় অস্বস্তি বোধ হয়, তেমনি এই প্রশ্নগুলোও পোকার মতন আমার মাথার ভিতরে চক্কর খাচ্ছে। মনে হচ্ছে উত্তর না পাওয়া পর্যন্ত শান্তি মিলবে না; মাথাটাও ভার ভার লাগছে। কার কাছে বলবো ভেবে পাচ্ছি না। সাধারণত আমি পরিচিত জনের সাথে মিশি না বা মিশতে চাইও না; একটু দূরে দূরেই থাকার চেষ্টা করি। তার উপর আমি আবার 'বেকুব', 'টিউবলাইট' হিসেবে পরিচিত। আমার উদর করোটি সম্পুর্ণ ফাঁপাই মনে হয়। সহজে কিছু বুঝতে পারি না, বলতেও পারি না। মুখে কথা আটকে যায়। তোতলানো স্বভাব। যার কারণে সবাই আমাকে এড়িয়ে চলে। আড়ালে হাসি ঠাট্টা করে বোধহয়। করুক, আমার কি? আমিও তো মাঝে মাঝে একা একা ক্লাসমেটদের কান্ডকারখানা দেখে হাসি। তবে ক্লাসমেটরা তাকালেই আমি হাসি বন্ধ করে দেই।

–

ওরা আমাকে প্রশ্ন করে- 'হাসতাছস কেন?'

আমি বলি- 'কই হাসতাছি? না তো?'

ওরা বলে- 'পাগল নাকি? এই মাত্র দেখলাম হাসতাছস মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে, এখন আবার না করস?'

আমি বলি- চোখে ভুল দেখস তোরা। বলে আর কথা বাড়াই না, অন্যদিকে পা বাড়াই।

ওরা হা করে তাকিয়ে থাকে। জানি আমার এই ব্যাপারটা নিয়ে ওদের মধ্যে আলোচনা হবে। হোক। আমার এই মুহুর্তে দরকার সামিনকে। ওহ! ভুলেই গেছি, সামিনকে বোধহয় আপনারা চিনেন না? সামিন, সামিন কাশমি আমার ফ্রেন্ড। শুধু ফ্রেন্ড না, ওকে আমি রেসপেক্ট প্লাস লাইকও করি। আবার ভয়ও পাই একটু। তবে কতোখানি মেপে দেখি নাই কখনো। হয়তো অনেক খানি, আবার হয়তো কম। ওকে মাঝে মাঝে ডেঞ্জারাস(!) মনে হয়। গত মাস কয়েক আগে ঢাকাতে গিয়েছিলাম বেড়াতে। তো সেখানে তোলা আমার কিছু ছবি দেখতে চাইলো ওইদিন। আমি প্রথমে দেখাতে চাচ্ছিলাম না। এই নিয়ে হঠাৎ দেখি খেপে গেল।

বললো- 'ওই! এইবার কিন্তু মারুম।'

আমি ভাবলাম ফান করতেছে, তাই বললাম- 'মারো।'

তক্ষনাৎ মেরে দিল। একেবারে চোখ বরাবর। ভাগ্যিস! মাথাটা নামিয়ে দিয়েছিলাম নীচের দিকে তক্ষনাৎ। পাঞ্চটা লাগলো একেবারে মাথায়। কব্জিতে জোড় আছে; মাথাটা অনেকক্ষন ভোঁ ভোঁ করছিল। ওর দেখলাম, কোন ভাবান্তর নাই এ ব্যাপারে। মেরেছে তো মেরেছে আমাকে, আবার রাগও দেখালো।

বললো- ' ফাজিল! তোমার সাথে আর কথাই বলবো না।'

আমি বললাম- ‘জব্বর ব্যাপার! মারলা তুমি আমারে, আবার রাগ দেখাও আমার সাথে।

সে উত্তর দেয় না। মুড দেখায়। আমিও কথা বাড়াই না, ক্যান্টিনে গিয়া মাথায় পানির ছিটা দিয়া আসি। ঠান্ডা, ঠান্ডা লাগে।’

ইশ! আজকে হঠাৎ করে সামিনের কথা মনে পড়ছে। অনেক দিন ধরে দেখি না। বাড়িতে গেছে। বাড়ি ওর ভোলা। আসব কবে ঠিক নাই। সামিনকে আমি ঠিক বুঝতে পারি না, বড় জটিল মনে হয়। কিন্তু সামিনকে এই কথা বললে, বলে- ‘জি না। আমি বেশ সহজ, সরল এবং সাধারণ। তুমি জটিল করে বুঝতে চাও দেখেই জটিল মনে হয় আমাকে।’

কিন্তু আমার তা মনে হয় না। কখন কি কয়, কি করে বোঝা যায় না? জটিলই লাগে! বেশ কিছু দিন আগে বন্ধুদের কাছ থেকে ধার দেনা করে একটা মোবাইল কিনেছিলাম।

এটা শুনে একবার খুব বড় গলায় আমারে বললো- ‘তোমারে একটা মোবাইল কার্ড দিব, সামনের মাসে।’

সেই সামনের মাস আর আসে নাই এখনো। কয়েকবার লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে জিজ্ঞেস করছিলাম, মোবাইল কার্ডের কথা। ও অবাক হয়ে বলে- ‘বলছিলাম নাকি মোবাইল কার্ডের কথা! মনে নাই।’

আমি বললাম- ‘তুমি প্রমিস করছিলা!’

সে বলে- ‘ও, দেখি! তাছাড়া মানুষ প্রমিস করে প্রমিস ভাঙ্গার জন্যে, প্রমিস রাখার জন্যে না। হে!হে!হে!’

এরপর আমি এইনিয়ে কথা বাড়াইনি। গতকালকে মোবাইল কল করে জিজ্ঞেস করছিলাম- ‘ব্যক কবে করবা ক্যাম্পাসে?’

সে বলে- ‘আইয়া, কি করুম এই ফাটা মরুভুমিতে? ক্যাম্পাস খুলুক, ক্লাস শুরু হইলে আইউম। ডেইট দিলে জানাইয়ো।’

আমি মনে মনে বলি- ‘আমার এতো ঠেকা লাগছে না? মোবাইল কইরা আপনারে ক্লাসের কথা জানাইতাম। আমি পারুম না। আপনার ইচ্ছা হইলে আইবা, না হইলে না।’

সাহস কইরা মুখ ফুটে বলতে পারি না। ভয় লাগে। বাধ্য হয়ে বলি- ‘হ্যাঁ হ্যাঁ। অবশ্যই।’

(২)

ডাইনিং-এ গিয়েছিলাম কিছুক্ষন আগে রাতের খাবার খেতে, ভালো লাগছিলো না এখনই খেতে। কিন্তু এখন না খেলে পরে আর খাবার পাওয়া যাবে না। না খেয়ে থাকতে হবে তাইলে সারা রাত। আর নইলে সাইলেন্সার লাগানো বিস্কুট-পানি খেয়ে থাকতে হবে। বাতাস লেগে এমন অবস্থা, গলে যাওয়া বাকি! গরুর মাংস ছাড়া আর কিছু ছিলো না, তাই দিয়েই খেতে হলো। গরম ভাত এর সাথে গরম তরকারি। ভালোই লাগছিল প্রথমে, আস্তে আস্তে টের পেলাম। টক টক স্বাদ। দাঁত চেপে খেতে লাগলাম। এর মাঝে ডাইনিং মামা টিভি ছেড়ে দিল। বাংলা সংবাদ শুরু হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন কিছু কথা কানে আসতে লাগলো- ‘বিশ্ববাজারের সাথে দ্রব্যমুল্যের দাম স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে, সরকার আবার তেল গ্যাস-এর মুল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে’।

‘একনেকের সভায় নতুন দুটি বিদ্যুৎ প্লান্ট নির্মানের সিদ্ধান্ত অনুমোদন’।

‘সরকার উত্তর বঙ্গের মঙ্গাপীড়িত এলাকায় দারিদ্রবিমোচনের জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়েদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে যাচ্ছে’।

‘শিল্পমন্ত্রী.....বলেছেন- ‘সরকার এইসকল বোমাবাজদের কখনো ক্ষমা করবে না’।

তিনি আরোও বলেছেন- ‘সরকারের উন্নয়নের জোয়ারকে বাঁধা দেয়ার জন্যে, দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করার জন্যে বিরোধী একটি মহল পরিকল্পিতভাবে সারাদেশে বোমা হামলা ঘটাচ্ছে। কিন্তু এতে করে সরকারের উন্নয়ন রুখতে পারবে! সরকার জনগণকে সাথে নিয়ে এই সকল নাশকতার দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবে .....।’

আর সহ্য হলো না। গা গুলিয়ে উঠলো। গলা দিয়ে নেমে যাওয়া গুরুপাক খাবার পাল্টা বের হয়ে আসলো, মুখটাকে চেপে ধরে দৌড় দিয়ে বেসিনে গিয়ে খুলে দিলাম। ওয়াক! ওয়াক! করে বের হয়ে আসতে লাগলো, কান দিয়ে ঢুকা অশ্রুত কথন আর গলা দিয়ে ঢুকা গুরুপাকের খিচুরি। দীর্ঘক্ষন কুলি করে মুখটাকে পরিষ্কার করলাম, তারপরও জিভে টক টক স্বাদ লাগছিল। হটাৎ, হটাৎ ঢেকুর উঠতে লাগলো। মুখে, মাথায়, গলায় পানি দিলাম। বেশ আরাম লাগলো। কিন্তু কানটাকে পরিষ্কার করবো কিভাবে?

এখন একটু খানি সুপারি হলে ভালো হত, মুখের এই বিভৎস স্বাদটা দূর হত। অল্প একটুই যথেষ্ট। কিন্তু এখন সুপারি আনতে গেলে নীচে নামতে হবে, আলসেমি লাগছে। থাক! দরকার নেই। শুয়েই থাকি। কি করা যায়? পড়তে ইচ্ছে করছে না। বন্ধ খুললেই এস আর সি স্যারের টার্ম টেষ্ট। আগেই ঘোষনা দিয়েই রেখেছেন। স্যারের পড়ানোর আলাদা স্টাইল আছে, খুব সুন্দর করে হাত নাড়িয়ে পড়ান। এক দৃষ্টি থেকে স্যারের দিকে থাকিয়ে থাকি। ক্লাসে ফিসফাসতো দূরের কথা, কেউ কারো দিকে তাকাই না। স্যার আমাদের পাঠ্যবই থেকে পড়ানোর চাইতে বাইরের ঘটনাবলী থেকে পড়ান বেশী।

ওইদিন কি একটা আলোচনা করতে গিয়ে স্যার বলতে লাগলেন- ‘এই যে কিছু লোক আছে না, প্রায়ই বলে বেড়ায় বিজ্ঞান যতো এগুচ্ছে ততোই ধর্মের সাথে দুরত্ব তৈরী হচ্ছে; কিন্তু আমি বলি, না। বিজ্ঞান যতো এগুচ্ছে ততোই ধর্মের সাথে মিশে যাচ্ছে। ধর্মের পুরাতন আবিস্কারকে নতুনভাবে আবিস্কার করে নিজের নামে চালিয়ে দিচ্ছে, তথাকথিত বিজ্ঞানীরা।’

স্যার বলতে লাগলেন- ‘যেমন ধরো, পেনড্রাইভ। এতো ছোট্ট কলমের মতো একটা জিনিস, কিন্তু বিস্ময়কর দেখ! এতে একশোটা ফ্লপির সমান তথ্য রাখতে পারে। এখন তো এক গিগাবাইটের উপরে পেনড্রাইভ বাজারে চলে এসেছে। এতে হাজার খানেক ফ্লপির সমান তথ্য জমা রাখতে পারে। ভবিষ্যতে হয়তো আরোও অনেক বেশী রাখা যাবে। আর আমাদের সাধারণ লোকেরা এই পেনড্রাইভ দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। কিন্তু আমি এদের বলি, এতে বিস্ময়ের কিছু নাই। এর থেকে বড় বিস্ময়কর জিনিষ হচ্ছে, সৃষ্টিকর্তা আমাদের জন্যে যে আমলনামা তৈরী করে রেখেছেন, সেটা। এই আমলনামায় একজন মানুষের সারা জীবনের সব তথ্য লিপিবদ্ধ থাকবে। প্রতিসেকেন্ডে আমরা কি করছি না করছি স-ব-লে-খা হচ্ছে। কি অবিশ্বাস্য! ভেবে দেখছো কখনো তোমরা? ধর একজন মানুষ যদি ষাট বছর বেঁচে থাকে, তাহলে তাঁর আমলনামায় লেখা হচ্ছে, ৩৬৫ গুন ৬০। কতো দিন হবে তোমরা উত্তর বের করবা? এতো দিনের প্রত্যেকটি মুহুর্তের হিসাব রাখা হচ্ছে এই আমলনামায়।

এখন বলতো, বিজ্ঞান যে নতুন এই পেনড্রাইভ তৈরী করেছে, তা কি আমাদের আমলনামা থেকে বিস্ময়কর?

আমরা স্ববিস্ময়ে মাথা নেড়ে বলি- 'না, স্যার।'

এক ফাঁকে সামিনের দিকে তাকালাম। আরোও কয়েকজন ফ্রেন্ডদের দেখলাম ওর দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে তাকাচ্ছে। সামিনকে দেখলাম, মুচকি মুচকি হাঁসছে। বুঝতে পারলাম, সামিন স্যারকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চাচ্ছে। কিন্তু এখন যদি কোন উল্টা পাল্টা প্রশ্ন করে বসে তাইলে স্যারের মুড চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। এমনিতেই আমরা কয়েকজন টার্গেট। স্যার এরপর আলোচনা শুরু করলেন পর্দাপ্রথার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে।

স্যার বলতে লাগলেন,'তোমরা লক্ষ্য করবে, মেয়েদের স্বাধীনতার নামে পর্দাপ্রথার বিরোধিতার করা হচ্ছে, কিন্তু তোমরা প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য কর। যেমন ধর- কলা, কলার কিন্তু খোসা রয়েছে। এই খোসা কলাকে প্রটেকশন করতেছে। তারপর ধর, লিচু। এরও শক্ত খোসা রয়েছে। তারপর ধর জাম্বুরা। এরও খোসা রয়েছে। এই সকল খোসাগুলি যেমন ফলগুলোকে প্রটেকশন দিচ্ছে, তেমনি পর্দাও মেয়েদের প্রটেকশন দিচ্ছে। যারা মেয়েদের পর্দাপ্রথার বিরোধিতা করতেছে, তারা আদতে মেয়েদের সহজে ভোগ করার প্রয়াস থেকে এসব বলতেছে।.....যারা নিজেদের কোন ধর্মের পরিচয়ে পরিচিত না করে মানবতাবাদী বলে, তারা চরিত্রহীন ছাড়া আর কিছু নয়। সবাই এক একটা লম্পট.....।'

আমি আর মনযোগ দিতে পারছিলাম না। হাই উঠতে লাগলো। আড়চোখে তাকালাম একবার সামিনের দিকে, কি যেন টুকে নিচ্ছে। কিছুক্ষন পর ক্লাস শেষে সবাই সামিনের দিকে অন্যরকম দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলো। ভাবখান এমন, এতোদিন পর জব্দ করা গেছে। কিন্তু সামিন দেখলাম, বেশ নিরুত্তাপ।

ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি ব্যাপার হাসছিলা যে? স্যার যে একেবারে.....।'

সামিন বললো, স্যার যা বলেছেন তা তিনি নিজেই বিশ্বাস করেন না। তিনি ধর্মের প্রতি অন্ধ আবেগ থেকেই যা তা বলেছেন। কোন যুক্তিবোধ কাজ করেনি ওই সময়। উনার মতো একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির ভিতরে এখনো র‍্যাশোনালিটি (Rationality) ডেভেলাপ করে নাই দেখে আমার হাসি পাচ্ছিল। কবে যে ডেভেলাপ করবে? আদৌ বোধহয় হবে না.....।'

কিছুক্ষনের মধ্যেই কয়েক জন এসে সামিনকে ঘিরে ধরলো। সবার চোখ খুশিতে চক চক করছে। ভাবখানা এমন, এতোদিন তো সুযোগ পেলে আল্লারে সাত আসমান থেকে নামিয়ে নিয়ে এসে একেবারে পোষ্টমর্টেম করে ফেলতে, এবার আমাদের পালা। নো ছাড়াছাড়ি। কিন্তু সামিনকে দেখলাম, খুব নিস্পৃহ। আমি একটু দূরে দাড়িয়ে ওর কথা শুনতে লাগলাম।

সামিন বলতেছে, '.....লুক! স্যার যা বলেছেন আমলনামা সম্পর্কে, তা থেকে কিন্তু আমলনামার অস্তিত্ব প্রমানিত হচ্ছে না, তাছাড়া স্যার যে লজিক দেখিয়েছেন পেনড্রাইভের সাথে তুলনা করে, তাতে প্রচুর ভূল রয়েছে। আর মেয়েদের পর্দাপ্রথার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মেয়েদেরকে উদ্দেশ্য করে যা মন্তব্য করেছেন, তা একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির বলা অনুচিত। ভার্সিটির শিক্ষকের সাথে মাদ্রাসা শিক্ষকের কোনো তফাৎ আর রইলো না? কি করে তিনি এধরনের কথা বললেন, তা বুঝতে পারছি না?'

আমাদের ফ্রেন্ড ইসমাইল বললো, কি ভূল বলেছেন? আমাদের কাছেতো কোন কিছু ভূল বলে মনে হয়নি? বরং আমার কাছে মনে হয়েছে স্যার অনেক কিছুই বলেননি ভদ্রতা বজায় রাখতে

গিয়ে.....। আমি হলে.....।'

সামিন অল্প একটু হেসে বললো, 'তাই বুঝি?..... হতে পারে। কারণ অন্ধবিশ্বাস থেকে তোমরা স্যারের কথাগুলি গলধঃকরণ করেছো, তাই তোমাদের কাছে ভূলটা ধরা পড়ে নি?'

কয়েকজন দেখলাম হে!হে! করে হেসে উঠলো। একজন কি জানি বললো ওকে। সামিনও বলতে শুরু করলো। আমি একটু এগিয়ে গেলাম, ভালোভাবে শোনার জন্য।

সামিন হাত নেড়ে নেড়ে বলতাছে,' .....আমলনামার সাথে পেনড্রাইভের তুলনা করা ভুল, কারণ- পেনড্রাইভ একটি বস্তু, যে কোন মুহুর্তে ভেঙ্গে যেতে পারে, একটি নির্দিষ্ট পরিমান তথ্য ধারণ করতে পারে যেমন, এক গিগাবাইটের পেনড্রাইভ কখনো এর থেকে দশমিক পরিমান বেশী তথ্য ধারণ করতে পারে না; এর থেকে কম অথবা সমান পারে। কিন্তু আমলনামাকে কি কেউ কখনো দেখেছে, কি রকম এর আকার। এর ধারণ ক্ষমতা কতো? কেউ জানে কি? স্যার যে হিসাব দিলেন ষাট বৎসর ব্যক্তির, কিন্তু গর্ভাবস্থায় যে শিশু মারা যাচ্ছে তার জন্য আমলনামা'র হিসাব কি হবে? সারা বিশ্বে প্রতি বছর হাজার হাজার মা মৃত সন্তান জন্ম দিচ্ছে, এই সকল মৃত সন্তানদের জন্য কি আলাদা আলাদা আমলনামা তৈরি করা হয়েছিল? যদি করা হয় তাহলে কেন? ঈশ্বর কি জানতেন না, এই সকল সন্তানেরা মারা যাবে জন্মের সাথে সাথে? ধরলাম, গর্ভাবস্থায় একজন শিশুর আমলনামা তৈরি হয়, কিন্তু ওই শিশুর আমলনামা তৈরি হওয়ার পর শিশুটির পিতামাতা এবরশ্ন করিয়ে সন্তান নষ্ট করে দিলেন, তাহলে কি হবে আমলনামার? গড কি জানতেন না, এরকম ঘটবে? কেন তৈরি করা হল আমলনামা? ..... যাই হোক এগুলো আসলে হালকা কথাবার্তা।

এখন অন্য দিকে আলোচনা করা যাক। ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে যে '*কিরামান কাতিবীন*' নামক ফেরেশতাগণ প্রত্যেক মানুষের সবকর্ম লিখে রাখছেন এবং 'ইয়াউমুল হাশর'(*ইয়াউম অর্থ দিন, আর হাশর অর্থ সমবেত হওয়া; প্রচলিত কথায় যাকে শেষ বিচারের দিন বলা হয়।*) এর সময় পাপ পূন্যের আমলনামাকে 'মীযান' (পরিমাপ যন্ত্র) দ্বারা ওজন করা হবে। যে দিকের পাল্লা ভারী হবে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে। শুধু ইসলাম ধর্ম নয়, হিন্দু ধর্মেও আছে নরকে নাকি যমরাজের চ্যালা চিত্রগুপ্ত নাম না কি যেন, সে বসে বসে মানুষের কর্ম লিখে রাখছে? ব্যাপারটা হাস্যকর। সব ধর্মেই বলে, ঈশ্বর সব কিছু জানেন, তিনি আমাদের ভবিষ্যৎ তৈরি করে রেখেছেন, তাঁর ইচ্ছেমতো আমরা চলতেছি। তাহলে আমরা যদি তাঁর ইচ্ছেতেই চলি, সবকিছু নির্দিষ্ট করা থাকে তবে আবার আমলনামা'র কি দরকার? ওটা'র মাঝে নতুন করে কি লিখা হবে? অযথা কেন এই লিখে রাখার জন্যে একজন ফেরেশতা নিয়োগ দেয়া হল? আবার গডকে বলা হয় সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, কিন্তু আমরা মানুষেরা সর্বজ্ঞানী নই, সর্বশক্তিমানতো দূরের কথা। আমরা মানুষেরা জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে কোন কিছু শিখলে লিখে রাখি, অথবা নানা কারণে পরবর্তীতে দরকার লাগতে পারে এই জন্যে আমরা তথ্য লিখে রাখি, জমা রাখি সেটা কাগজেই হোক, পেডে হোক অথবা কম্পিউটারে বা পেনড্রাইভেই হোক। কিন্তু গডের কি ভূলে যাওয়ার ভয় আছে, যার কারণে আমাদের কর্মফল লিখে রাখতাছেন? এই ভুলে যাওয়ার ভয় থাকলে তাকে এতো কেন সুন্দর সুন্দর বিশেষণ দিয়ে যেমন '*ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদীর* (নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান)', '*ইন্নাল্লাহ সামীউন আলীম* (নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী)', অথবা '*ইন্নাল্লাহ সামীউন বাসীর* (নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা)' বলে ডাকা হয়?.... হে!হে!

নাকি আমলনামা'য় লিখে না রাখলে হাশরের ময়দানে আমাদের কর্মফল নিয়ে কিছু বললে আমরা প্রোটেষ্ট করবো, আমরা বলবো নাকি, সারা জীবন আপনাকে ডেকেছি, নামাজ পড়েছি রেগুলার, মন্দিরে পূঁজো দিয়েছি, আপনি এখন যা বলতাছেন তা ভূল। তাইলেতো এই আমলনামায় লিখা শেষ হওয়ার পর একজন নিরপেক্ষ কাউরে দিয়ে এটাস্ট করে নেয়া দরকার, নাহলে আমরা যদি তখন আমলনামা'রে জাল বলি, প্রমান দিতে পারবেন না তাহলে.....হা! হা!। কি বলো?'

কেউ একজন বললো, 'ধ্যাৎ! সবসময় ফাজলামি। যখন তোর উপর গজব পড়বো, তখন বুঝবি। এখন যতো খুশি ফাল দেও।'

সামিন আরোও জোরে হাসা শুরু করলো। ওরা সামিনের হাসি দেখে আস্তে আস্তে সরে পড়তে চাচ্ছিলো।

সামিন ওদের বললো, 'শোন, শোন। স্যার পর্দাপ্রথা নিয়ে যা বললো, 'তা একটু পোষ্টমর্টেম করে দেই। স্যার বললো, লিচুর খোসা আছে, কলার খোসা আছে, এগুলি ওদের প্রোটেকশন দেয়, তাই প্রকৃতির অন্যান্য ফলমূলের খোসার মতো মেয়েদেরও পর্দাদরকার। এগুলি মেয়েদের প্রটেকশন দেবে।.....হায় হায় এই কথাগুলি কিভাবে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের মুখ থেকে বের হল? মেয়েরা আগে ছিল পুরুষদের হাতের পুতুল এখন হইছে গাছের ফল। কলার খোসা ছাড়িয়ে আমরা মুখে দেই; মেয়েদের পর্দাখুলে কি পুরুষেরা.....ছি!ছি!।

স্যার আরো বললেন, মানবতাবাদীরা নাকি এক একটা লম্পট। মেয়েদের সব সময় ভোগ করতে চায়। কিন্তু ধার্মিকেরা মেয়েদের কোথায় নামিয়েছে আজ, সেটা দেখেছো? পোষাক আশাক অবশ্যই পড়তে হবে তাই বলে পুরুষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন? মেয়েদের কি সিদ্বান্ত নেয়ার ক্ষমতা নেই, সে কি পড়বে কি পড়বে না? যার যার রুচি অনুযায়ী পড়বে সেখানে তোমার আমার নাক গলাবার কি আছে? কোনো মেয়ে কি কখনো পুরুষের পোষাকের ব্যাপারে মন্তব্য করেছে? তোমরা এইটা পড়বা না ওইটা পড়বা? পুরুষের এতো গায়ে পড়া ভাব কেন?.....'।

আমি আর দাড়ালাম না। আমাদের টি কে ডি স্যার ক্লাস রুমে চলে আসছেন, ওদেরও দেখলাম তৎক্ষণাৎ সরে পড়লো, যাবার আগে জানি কি যেন বলে গেল? ভালো করে শুনতে পারলাম না?.....

(৩)

বাবা-মা আমার নাম রেখেছিলো আনিন্দ্য। স্কুলের রাখি টিচার আমাকে আদর করে ডাকতেন আনন্দ। এখানে আসার পর আমার নাম কখনো আনু কখনো আন্দু আবার কখনো আন্ডু। যে যেমন খুশি মতো ডাকে, সব ডাকেই সাড়া দেই। কোনো আপত্তি নাই।

'আন্ডু! এই আন্ডু শুয়ে পড়ছস নাকি? এতো তাড়াতাড়ি যে....?'- পার্থ ডাকতাছে। রুমমেট প্লাস ক্লাসেমেট।

'না। জাস্ট চোখ বুঁজে আছি, ভালো লাগতাছে না?'-বললাম আমি।

'কি হইসে? জ্বর না কি?'

'না। এমনিই শুয়ে আছি।'

'কি এতো ভাবস সবসময় তুই? পাগল হয়ে যাবি দেখিস আবার!'

আমি বললাম- 'তোরা তো তাই-ই ভাবস এখনিই।'

পার্থ আর কথা বাড়ালো না। কাপড় পালটাতে শুরু করলো। আসলেই কি যেনো হইসে আমার? বুঝতে পারি না। একবার কিছু ভাবতে বসলে চিন্তার আর খেঁই পাই না। কোথা থেকে কোথায় যে চলে যাই.....।

‘ভাত খাইবি না কি? চল।’- পার্থ বললো

‘আমি খাইয়া নিসি। তুই খাইয়া আয়। তাড়াতাড়ি যা, পরে আর পাবি না কিছু।’- বললাম আমি।
‘কি দিয়া খাইলি?’

‘গরুর মাংস ছাড়া আর কিছু পাই নাই।’

‘মাছ নাই?’

‘না। ডিম পর্যন্ত পাই নাই। দেখ গিয়া ডাল পাস নাকি। তবে সবজি বোধহয় পাইবি না।’

‘ধ-্য-া-ৎ! আগে যদি জানতাম, বাইরে থেকে খাইয়া আইতাম।’

আমি আলতো করে হেসে বললাম, ‘বিফ দিয়া খাইয়া নে। একবার দুইবার খাইলে কিচ্ছু হইবো না। তাছাড়া তোর কাছে তো গঙ্গা জল আছে, অসুবিধা কি? বিফ দিয়া খাইয়া আধ গ্লাস গঙ্গা জল খাইয়া নিবি। স-ব প-া-প ফিনিশ।’

পার্থ আমার দিকে কড়া চোখে তাকালো। কি জানি বলতে চাচ্ছে, পারছে না। পার্থ, পার্থ সারথী ভট্টাচার্য আমাদের ক্লাসের একমাত্র ব্রাহ্মণ। পৈতাধারী। আমাদের সাথে হলে থাকে, অথচ সব সময় গা বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা করে। ডাইনিং -এ খেতে বসলে আলাদা কর্নারে এক সাথে সব কিছু নিয়া বসে। আমাদের সাথে খেতে বসে না। সব সময় ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলে। প্রত্যেকবার বাড়িতে গেলে একটা হরলিকসের বোতলে করে গঙ্গা জল নিয়ে আসে। ওদের অনেক আত্মীয় স্বজন ভারতে থাকেন, প্রায়ই আসা যাওয়া করেন এদেশে। পার্থরে মাঝে মাঝে দেখি লুকিয়ে লুকিয়ে গঙ্গা জল চামুচে করে ছিটিয়ে দিচ্ছে ওর বিছানায়, জামা কাপড়ে। আমার দিকে একবার চোখ পরে গিয়েছিল, বেশ অস্বস্থিতে পড়লো মনে হলো। আমি আর প্রশ্ন করিনি এ নিয়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে, অথচ এখনো সংস্কার মুক্তি ঘটলো না! জং ধরা বস্তাপচা অপবিশ্বাস আঁকড়ে ধরে আছে। কি যে অবস্থা। শুধু পার্থ না, প্রায় সবাই এইরকম। সবাই নিজেদের যতটুকু মানুষ বলে পরিচয় দিতে আগ্রহী তার থেকে অনেক অনেক বেশী নিজেদের মুসলামান, হিন্দু বলে পরিচয় করাতে ব্যস্ত। আমাদের আরেক ফ্রেন্ড সুকমল রায়। ওদের ফ্যামিলি অনুকূল ঠাকুরের শিষ্য। প্রত্যেক শুক্রবারে ওরা নিরামিশ খায়। পেঁয়াজ, রসুন, মাছ, মাংস, ডিম কিচ্ছু না। মুগ ডাল খায়, মুসুরি ডাল খায় না। অথচ ১০০ গ্রাম মুগডালে প্রোটিন আছে ২৪ গ্রাম আর ১০০ গ্রাম মুসুরি ডালে প্রোটিন আছে ২২.৩ গ্রাম। দুধ, ঘি, মাখন, পনীর ঠিকিই খায়। ভাবখানা এমন এগুলোতে প্রোটিন নেই। কিন্তু দুধের ছানা বা পনীরে প্রোটিন আছে মাছ-মাংস- ডিম থেকে অনেক বেশী। আমাদের সুকমল রায়ের মতো বন্ধুরা একসাথে মুসলিম বন্ধুদের সাথে চলে কিন্তু ওদের সাথে বসে খায় না। এক পাতে শেয়ার করে খাওয়াতো কল্পনার বাইরে। সবসময় ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলার চেষ্টা। খাবার বেলায় আলাদা দূরত্বে বসে খায়। ডাইনিং বা কেন্টিনে এক সাথে খেতেই চায় না। বাধ্য হয়ে কখনো খেলে, খাওয়ার পর গল গল করে কুলি করতে করতে দফারফা করে দেয়। একবার আমরা ক্লাসের প্রায় সব ফ্রেন্ডরা একসাথে পিকনিকে গেলাম। হেভী খানাপিনা হলো। দুপুরে লাঞ্চ ছিলো বিরিয়ানী। ওইদিন ছিলো শুক্রবার। সুকমল প্রথমে যেতে চায় নি। পরে সব ফ্রেন্ডরা অনুরোধ করার পর ও আসলো। কিন্তু দুপুরে খেতে বসার পর ও কিছু খায় না, চুপ করে বসে আছে। ওকে দেয়া বিরিয়ানীর প্যাকেট ফিরিয়ে দিলো আরেক জনকে। সবাই সুকমলকে এসে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, কেনো খেতে চাচ্ছে না? প্রথমে সুকমল কিছু বলতেছে না। পরে বললো, ধর্মীয় নিষেধ আছে। সবাই খুব আপসোস করলো, আগে জানালে সুকমলের বাসা থেকেই ওর জন্যে খাবার নিয়ে আসা যেতো। আমার খাওয়া শেষে সুকমলের সাথে বেরোলাম, কোনো ফলমূল পাওয়া যায় কি না দেখতে? বেশ কিছুক্ষন হাঁটাহাটির পর একটি টং-এর মতো দোকানে কলা আর কেক পেলাম।

সুকমল বললো- 'আমি কেক আর কলা খাবো।'

আমি ওকে বললাম, 'কেকতো ডিম, ময়দা মিশিয়ে বানায়। তোর অসুবিধা হবে না?'

সে বললো, 'নাহ! খাওয়া যায়।'

বেশ অবাক হলাম। তাইলে বিরিয়ানী খেতে কি দোষ ছিলো? দোকান থেকে আসার সময় কয়েক পিস কেক অন্যান্যদের জন্য নিয়ে নিলাম। কিন্তু নিয়ে আসার পর দেখা গেলো কয়েক জনের কম হয়ে গেছে। তখন আমি সুকমলকে বললাম, ওর অংশ থেকে কিছু অংশ ভেঙ্গে দিতে। কিছু বললো না। আমাদের এক ফ্রেন্ড আনিস সুকমলের দিকে হাত বাড়ালো, কেকের কিছু অংশ ভেঙ্গে নেয়ার জন্যে। সুকমল তক্ষনাৎ রে রে করে উঠে পিছনে সরে গেলো। ওর আচরণ দেখে বেশ অবাক হলাম, কারণ জানতে চাইলাম।

সুকমল বললো- 'শুক্রবারে গুরুবার আমাদের। আমিষ জাতীয় কিছু খেতে মানা, আর মুসলমানের হাত থেকে.....।'

এই কথা বলে আমার দিকে তাকিয়ে হে!হে! করে হাসতে লাগলো। ঘৃণায় আমার সারা শরীর রি রি করে উঠলো।

(৪)

পার্থ হাতমুখ ধোঁয়ে ডাইনিং-এ গেছে। আমি জানালার তাকিয়ে বসে আছি। ঠান্ডা ঠান্ডা লাগতাছে বেশ। শীত আসা শুরু করেছে। বাইরে নিকশ কালো অন্ধকার। চাঁদ, তারা দেখা যাচ্ছে না। আজকে আমবস্যা নাকি? দূরে মাঝে মাঝে জোনাকির আলো দেখা যাচ্ছে। এ এক অদ্ভুত রকম সুন্দর। আমার মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে করে, সারা রাত যেনো বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু রাত একটু গভীর হলে বাধ সাধে গান্ডুস গান্ডুস ড্রাকুলাগুলো। কানের কাছে এসে বন বন আওয়াজ তোলে। কি যেন বলতে চায় ওরা? বুঝতে পারি না। এদেরও কি সমাজ আছে? এদের সমাজে কি রাজনীতিবিদ কিংবা কবি আছে, গীতিকার আছে, আছে কি আবৃত্তিকার? এতো সুন্দর করে এরা পাখা দিয়ে আওয়াজ তোলে কিভাবে? জানি না। তাল-লয় ঠিক রেখে ডানা ঝাপটায় কি করে? মশার কথা ভাবতে আর ভালো লাগতাছে না। তার থেকে বরং অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু একমনে তো কিছু দেখা যায় না? অনবরত মস্তিষ্কে কোনো না কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা তৈরী হচ্ছে। কোনো প্রকার চিন্তা ছাড়া বোধহয় একটা সেকেন্ডও থাকা যায় না। ঘুমালেও না। মস্তিষ্ক অনবরত কাজ করতেছে। কোনো বিশ্রাম নেই, নেই কোনো ছুটি। জন্মের পর থেকেই একদম মৃত্যু পর্যন্ত। মস্তিষ্কের সেলগুলোর মাইটোকন্ড্রিয়া কি পরিমান শক্তি সাপ্লাই দিচ্ছে সেলগুলোতে প্রতি মূহুর্তে? বা শরীরের অন্য অংশের সেলগুলোর মাইটোকন্ড্রিয়া? এর কি কোনো হিসাব আছে? জানি না। আচ্ছা, বর্তমান ক্রোম্যাগনন বা Homo Sapiens এর পূর্ববর্তী স্থর হচ্ছে নিয়ানডার্থাল মানুষ (Homo sapiens neanderthalensis)। এই নিয়ানডার্থাল মানুষদের বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভব ঘটে এখন থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ থেকে তিন লক্ষ বছর আগে। আর আজকের ক্রোম্যাগনন বা বিশুদ্ধ আধুনিক মানুষের রূপান্তর ঘটেছে প্রায় পঁচিশ হাজার বছর আগে মাত্র। বিবর্তনতো এখনো চলতেছে, তাহলে আজকের আধুনিক মানুষ থেকে পরবর্তী কোনো নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটবে কি? ঘটলে নাম কি রাখা হবে ওই নতুন প্রজাতির? *Homo ....??* কি ধরনের হবে তাদের শারীরিক আকার আকৃতি? কি ধরনের হবে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি? আনুমানিক কত বছর পর আজকের ক্রোম্যাগনন মানুষ থেকে এদের রূপান্তর ঘটতে পারে? এ নিয়ে পৃথিবীর কোথাও কি কোনো গবেষনা হয়েছে বা হচ্ছে? কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবে। কিন্তু কাকে? সামিনতো বাড়িতে। আসবে কবে ঠিক নাই। দেখি!

চারিদিকে ঘন অন্ধকার। ঝি ঝি পোকার একটানা ডাক ভেসে আসছে। হটাৎ থেমে যায়, কিছুক্ষন

পর আবার শুরু হয়। জানালা দিয়ে দূরের টিলাকে কালো রঙের কিংভূতকিমাকার লাগছে। টিলার উপর কয়েকটা গাছ। পাতা নেই একটাও। শুকিয়ে যাচ্ছে দিন দিন। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতেছে বোধহয়। এতো অন্ধকার দেখতে ভালোই লাগছে। হঠাৎ করে একটা প্রশ্ন নতুন করে মনে পড়ছে। বেশ কয়েক বছর আগে আমার এক পরিচিত বড়ভাই আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন- 'অন্ধকারের কি কোনো উৎস আছে? আলোরতো উৎস লাগে কিন্তু অন্ধকারের? অন্ধকার বিষয়টা আসলে কি?'

আমি তখন পারি নি উত্তর দিতে। পরে সামিনরে জিজ্ঞেস করেছিলাম একদিন।

ও ঝটপট উত্তর দিয়েছিলো- 'সুর্যের আলো বা অন্য কোনো উৎস থেকে আলো কোনো বস্তুতে পড়লে এবং সেই বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে এসে পড়লে তখন আমরা সেই বস্তু দেখতে পাই। যে বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে আসে না তা আমরা দেখতে পাই না।'

তার মানে দাড়াচ্ছে, এই যে সামনে এতো ঘন অন্ধকার, এর অর্থ হচ্ছে এখানে রাস্তার লাইটপোস্টের আলো বা সূর্যের আলো সরাসরি বা চাঁদের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের পৃথিবীতে এসে আমার জানলার সামনের ওই এলাকায় কোনো বস্তুর উপর পড়তেছে না এবং সেই কারণে বস্তু থেকেও আলো প্রতিফলিত হয়ে আমার চোখে পড়তেছে না। যার কারণে অন্ধকার লাগতাছে। তাহলে অন্ধকারের উৎস হচ্ছে আলো বস্তুর উপর না পড়া কিংবা আলো প্রতিফলিত না হয়ে আমাদের চোখে এসে না পড়া।

পার্থ ডাইনিং থেকে চলে এসেছে। গুন গুন করে সুর করে গান গাচ্ছে। ওর গানের গলা দারুন। আমার বেশ লাগে শুনতে। আগে ও যখন ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে গাইতো তখন আমি টেবিলে হাত দিয়ে শব্দ করে তবলা বাজানোর চেষ্টা করতাম। পার্থ আমার এই নাকানি চোবানি খাওয়া বেসুরা, বেতাল তবলা বাজানোর ধরন দেখে মুচকি মুচকি হাসতো, আর মাঝে মাঝে আমার পিঠ চাপড়ে দিতো। আমি তখন খুশিতে গদগদ হয়ে আরো জোরে টেবিল চাপড়িয়ে তবলা বাজানোর চেষ্টা করতাম। হাত লাল হয়ে যেতো। জ্বালা করতো। পার্থর গানের সুরে তন্ময় আমি এগুলির পরোয়া করতাম না।

পার্থরে জিজ্ঞেস করলাম - 'ভাত খাইয়া নিছস নাকি?'

-'হুঁ। মামার দোকান থেকে একটা ডিম নিয়া বিল্লালরে দিসি। সে ভাজি করে দিলো।'

বিল্লাল আমাদের ডাইনিং-এ কাজ করে। আমার সাথে তার দারুন ভাব। আমি ডাইনিং-এ গেলেই সে আমার কাছে ছুটে আসে। আমার যা কিছু লাগে সে নিয়া আসে। কিন্তু আমিতো ওরে কখনো বকসিস দেই না, তাহলে আমাকে কেন খাতির করে? জানি না।

'আচ্ছা, পার্থ একটা কথা বলি। মাইন্ড করিস না।'- বললাম আমি।

'বল। মাইন্ড করার মতো হলে করবো, না হলে না।'- পার্থ জবাব দিলো।

'তাহলে থাক।'

'ঠিক আছে বল তুই। মাইন্ড করবো না।'

'তুই গরুর মাংস খাস না কেন? তুইতো মনপ্রাণ দিয়ে ধর্ম পালন করস। কিন্তু ধর্মেতো এ ব্যাপারে

নিষেধ নেই।'

'কে বলেছে নেই। নিষেধ আছে।'

'কিন্তু সামিন যে ওই দিন বললো।'

'ধ্যাৎ! গুল্লি মার তোর সামিনরে....। সামিন বললেই হলো। ওতো একটা .....।' পার্থ একটু রেগে কিছু বলতে চাচ্ছিল সামিন সম্পর্কে, কিন্তু আমার দিকে তাকিয়ে আটকে গেলো।'

'তার মানে তুই বলতে চাচ্ছিস, হিন্দু ধর্মে গরু মাংস খাওয়া সম্পর্কে নিষেধ আছে, তাহলে সেটা কোথায়? আমার জানা মতে তো এরকম কোনো নিষেধ নাই।'

'তুইও তো সামিনের মতোই। ব্যাটা নাস্তিক!!'

আমি হো! হো! করে হেসে উঠলাম। বহুদিন প্রাণ খুলে হাসি নি। অনেকদিন পর 'নাস্তিক' শব্দটি শুনলাম। পার্থ আমার হাসির ধরণ দেখে থতমত খেয়ে গেলো, বললো- 'কি হয়েছে? এতো হাসছিস কেন? হাসির কি হলো?'

'নারে ভাই, আমি নাস্তিক না। নাস্তিক হওয়া এতো সোজা না। আর মুখের কথায় নাস্তিক সাজা যায় না। আমি রে ভাই এখনোও সংশয়বাদী। ইংরেজীতে যারে বলে Skeptic। তবে সত্যি কথা বলতে গেলে আমি নাস্তিক হওয়ার চেষ্টায় আছি। কবে হবো জানি না।'- একটানা বললাম আমি।
'সংশয়বাদী, Skeptic এগুলোর মানে কি?'- পার্থ বেশ অবাক হয়ে বললো।

'আরেক দিন বলবো ভালো করে। তবে এতটুকু বলে রাখি সংশয়বাদীরা কোনো কিছুকেই পরম সত্য, পরম জ্ঞান বলে মনে করেন না। সব কিছুকেই প্রশ্ন করে, বিচার বিশ্লেষনের মাধ্যমে গ্রহন করেন অথবা ত্যাগ করেন; সেটা ধর্মই হোক, বিজ্ঞানই হোক আর দর্শনই হোক।'

'তুই দেখি ফিলসফারদের মতো কথা বলতেছিস। সামিনের সাথে থাকতে থাকতে তোর ভিতরেও ভাইরাস ঢুকছে দেখি।'

আমি কিছুক্ষন চুপ থেকে আমার নির্লিপ্ত মার্কা হাসি দিলাম। হাসির ধরণ দেখে পার্থ ওঠে নিজের বিছানায় চলে গেল। কোনো কথাই আর বললো না। আমার স্টকে কয়েক ধরনের হাসি আছে। সময়মতো একেকটা ব্যবহার করি। প্রথমটা হচ্ছে অট্টহাসি। যে কোন ব্যাপারে আমি এমন জোরে হাসতে পারি যে সামনে থাকে সে থতমত খেয়ে যায়। সাধারণ বিষয় অথবা হাসির কোনো ব্যাপার না হলেও, এই গুলো নিয়ে আমার দম ফাটানো হাসি দেখলে সবাই প্রথমে অস্বস্থিতে পড়ে যায়, পরবর্তীতে আমার সঙ্গেও হাসিতে যোগ দেয়, তখনই আমি হাসি থামিয়ে চোখমুখ শক্ত করে তাকাই, তাতে আবারও ওরা অস্বস্থি বোধ করে। দ্বিতীয় ধরনের হাসি হচ্ছে সাধারণ হাসি, যাকে আমি 'প্রাণখুলে হাসি' বলি। এই হাসি আমি খুব কমই দিই। তৃতীয় ধরণের হাসি হচ্ছে চাপা হাসি। এই হাসি আমি সাধারণত প্রায়ই দেই। কখনো কোন কথা হঠাৎ মনে পড়লে বা কারো উদ্ভট কান্ডকারখানা দেখলে একা একা মাথা দুলিয়ে হাসি। তবে অন্য তাকালেই হাসি বন্ধ করে দেই। এমন ভাব করি যেন, কেউ আমার হাসি দেখে অপরাধ করে ফেলেছে। তবে এই 'চাপা হাসি' নিয়ে সবচেয়ে বেশি বকা খাইছি সামিনের কাছ থেকে। সামিন আমারে নিষেধ দিছে আমি যেন এরকম আর না করি কিংবা ও যেন আমাকে কখনো এরকম করে হাসতে না দেখে। আর চতুর্থ ধরণের হাসি হচ্ছে 'নির্লিপ্ত হাসি'। যদি কখনোও খুব বিরক্ত হই কোনো কারণে, কিন্তু প্রকাশ করতে পারছি না বা বলার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছি না তখন এই ধরণের হাসি দিই। ছোট বেলা থেকে শুনে আসছি, আমার মুখের গঠন দেখতে খুব বোকা বোকা, আর চোখ দুইটা ছোট ছোট

হওয়ার কারণে ইদুরের মতো লাগে দেখতে। তাই যখন 'নির্লিপ্ত হাসি' বা কষ্ট করে হাসার জন্যে গালটা ভাঁজ করি তখন খুব বিশ্রি লাগে দেখতে। আয়নার সামনে আমি নির্লিপ্ত মার্কা হাসি দিয়ে দেখেছি, মনে হয় যেন কোনো উদ্ভট জীব মুখ ফাঁক করে আছে। এতে আমার সুবিধাই হয়েছে, সবাই খুব তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, বোকা বোকা কথা শুনে সবাই যখন আমার মস্তিষ্কের সুস্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে, আমি সেটা খুব অনুভব করি। দারুন লাগে।

পার্থ বিছানায় শুয়ে শুয়ে ম্যাগাজিন পড়ার চেষ্টা করছে। পড়ার চেষ্টা করছে বলছি কারণ মাঝে মাঝে আমার দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছে। হয়তো কিছু বলতে চায়। জানি কি বলতে চাচ্ছে, তবে আমি এ মাসে ওকে দিতে পারবো না। আমার নিজেরই টানাটানি চলতেছে। বেশ কিছু বাকি রয়েছে। সেগুলো শোধ করতে হবে আগে। বাড়িতে খবর পাঠিয়েছি সপ্তাহ হয়ে গেলো, এখনো কোনো জবাব আসে নাই। আরোও দু একদিন অপেক্ষা করে দেখি, নাহলে আবার মোবাইল করতে হবে।.....

আমার এখন গত সেমিস্টারের ঐ দিনের কথা ভাবতে ইচ্ছে করতেছে। সামিন ওই দিন দারুন একটা কাজ করছিলো, বেশ কয়েকজনরে ভালো করে শিক্ষা দিছে। এ দিনের পর আর এরা এ নিয়ে কোনো কথা বাড়ায় নি। দিন তারিখ সঠিক মনে পড়ছে না তবে ঐদিন ছিলো গত সেমিস্টারের 'বি' গ্রুপের সেমিনার। ওদের টপিকসটাও পুরোপুরি মনে নাই। তবে মোটামুটি মনে আছে খাদ্যে পুষ্টি উপাদান এই জাতীয় কিছু একটা। 'বি' গ্রুপ থেকে একেক জন এসে সেমিনার পেপার উপস্থাপন করতেছে আর তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে। প্রশ্ন কখনো দর্শকসারি থেকে আমাদের মধ্যে থেকে করা হচ্ছিলো আবার কখনো স্যার-ম্যাডামরা করতেছিলেন। 'বি' গ্রুপ থেকে যখন হৈমন্তী এসে সেমিনার পেপার উপস্থাপন শেষ করলো, তখন হঠাৎ সামিন দাড়িয়ে একটি প্রশ্ন করার অনুমতি চাইলো। টিকেডি স্যার অনুমতি দেয়ার পর, সামিন সেমিনারের পেপারের একটি পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করে বললো, 'এখানে নিচের দিকে উল্লেখ করা হয়েছে যে ধর্মীয় বিধি-নিষেধের কারণে অনেক সময় অনেকে পুষ্টিকর খাদ্যগ্রহন থেকে বঞ্চিত হন। যেমন- হিন্দু ধর্মগ্রন্থে গরুর মাংস খাবার উপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় হিন্দু ধর্মালম্বীরা গরুর মাংস খান না, আবার ইসলাম ধর্মালম্বীরা তাদের ধর্মগ্রন্থে শুকরের মাংস গ্রহন সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা থাকায় ওই মাংস খান না.....। কিন্তু স্যার, আমি যতদূর জানি গরুমাংস গ্রহন করার ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মগ্রন্থে তেমন কোনো স্ট্রং বিধিনিষেধ নেই, বরঞ্চ ধর্মগ্রন্থগুলিতে গরুমাংস খাওয়ার সপক্ষে অনেক মত দিয়েছে।..... আমার মনে হয় ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কিত উল্লেখিত অংশটি কারেকশন করা উচিত।'

হৈমন্তী তখন বললো- 'পেপারের এই অংশটুকু আমি লিখেছি, আর আমি জানি সেটা কারেক্ট। কারণ আমরা ছোটবেলা থেকেই জেনে আসছি, হিন্দুধর্মগ্রন্থে গরুমাংস গ্রহন করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাই কারেকশন করার কোনো প্রয়োজন আসতাছে না।'

তখন ডি এম এইচ স্যার এই অস্বস্থিকর পরিস্থিতি সামালে নেয়ার জন্য বললেন, 'প্রশ্নটি যখন রিলিজিয়াস সেন্টিমেন্ট এর সাথে জড়িত, তাই প্রশ্নটি উইড্রো করা হোক।' অন্যান্য স্যার-ম্যাডামরা এ ব্যাপারে মাথা নাড়লেন। সেমিনার শেষ হওয়ার পর সবাই বেরিয়ে যাওয়ার পর প্রদীপ, মৃণাল, পার্থ, হৈমন্তীসহ আরোও কয়েকজন গিয়ে সামিনকে ধরলো। আমি কাছেই ছিলাম। ওরা সামিনরে বললো- তুই যে বললি, হিন্দুধর্মগ্রন্থে কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই, তুই প্রমান দিতে পারবি?'

সামিন হেসে বললো- 'প্রমান দিলে কি হবে? তোরা কি গরুর মাংস খাওয়া শুরু করে দিবি আজ থেকে?'

আমি এক ফাঁকে সাহস করে বলে ফেললাম- 'না, না। গরু যে ওদের কাছে দেবতা। আবার কোনো কোনো হিন্দুদের কাছে দেখি, গরু মায়ের মতো। কেউ কি তাঁর মায়ের মাংস খেতে পারে? ছি!

ছি!। .....তবে গরুর মলমূত্র দিয়ে সারা বাড়ি ঘর লেপে দেয়া তাঁদের জন্যে পূন্যের কাজ। কিন্তু কোনো হিন্দু কি তাঁদের মায়ের মলমূত্র দিয়ে সারা বাড়ি লেপে দেয়াকে পূন্যের কাজ বলে মনে করে?.....হে! হে!হে!'

প্রদীপ আমার দিকে রক্তচক্ষু করে তাকিয়ে বললো, 'চুপ কর! ব্যাটা নাস্তিকের নাস্তিক!'

আমি চুপ করে ফেললাম। তখন সামিন বললো, শোন, রাগারাগি করে লাভ নেই। আমি তো এখন বেদ, গীতা, উপনিষদ নিয়ে আসে নি, তাই আমি তোমাদের কিছু ধর্মগ্রন্থের সূত্র উল্লেখ করছি; তোমরা বাড়িতে গিয়ে মিলিয়ে নিয়ো, কেমন?

মৃণাল বললো, 'আমি লিখে নিচ্ছি, বাসায় গিয়ে চেক করবো আজই।'

সামিন অল্প একটু হেসে বলা শুরু করলো, 'ঠিক আছে। কোনো অসুবিধা নাই। তোমাদের হিন্দুধর্ম গ্রন্থগুলোর মধ্যে বেদ অন্যতম। এই বেদ আবার চার ভাগে বিভক্ত। এদের মধ্যে ঋগ্বেদ অন্যতম এবং সবচেয়ে প্রাচীন বলে ধরা হয়। বাকি গুলো হচ্ছে যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। যাই হোক, ঋগ্বেদ সংহিতার ১০/৭/৬ নং ঋক-এ অগ্নির কাছে প্রার্থনায় *গাভীদের খন্ড খন্ড করে ছেদন* করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আবার ঋগ্বেদ সংহিতার ১০/৮৪/১৪ নং ঋক-এ দেবতা ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে এভাবে, '*তুমি আমার জন্যে পনের-কুড়িটি বৃষ রান্না করে দাও, আমি তা খেয়ে আমার উদরের দুদিক পূর্ণ করি, আর আমার শরীর স্থুল করি।*' বৃষ অর্থ হচ্ছে বলদ। আবার সংস্কৃতিতে অতিথিদের আরেক নাম হচ্ছে 'গোঘ্ন'। এই 'গোঘ্ন' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে- যার জন্যে গরু মারতে হয়। প্রাচীন ভারতে বাড়িতে অতিথি এলে তাকে গোমাংস দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো বলেই এই অতিথিদের আরেক নাম গোঘ্ন হয়ে গেছে। তৎকালীন গরু মাংস ভোজীরা এতো গরুর মাংস খেতে শুরু করেছিলো যে আশ্বলায়ন গৃহ্যসুত্র ১/২৪/২৫-এর বিধান অনুযায়ী *বাড়িতে অতিথি এলে গরুদের বাচাঁবার জন্যে ছেঁড়ে দেয়া হতো, যাতে অতিথিরা মনে করে বাড়ীতে গরু নেই*।....'

সামিন এতোক্ষন একটানা বলার পর একটু থামলো, দম নিয়ে আবার বললো, 'লাগবে আরোও সুত্র? দাড়াও, আরো বলছি! ধীরে ধীরে ...এখন আসি যজুর্বেদে। বেদের চার ভাগের মধ্যে আরেক ভাগ হচ্ছে যজুর্বেদ। এই যজুর্বেদ আবার দু ভাগে বিভক্ত, যথা : শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ। এই কৃষ্ণযজুর্বেদের আরেক নাম 'তৈত্তরীয় সংহিতা' এবং শুক্ল যজুর্বেদের আরেক নাম 'বাজসনেয়ি সংহিতা'। যাহোক, এখন এই তৈত্তরীয় সংহিতায় শুধু গরু হত্যার নির্দেশ দেয়া হয় নি, কোন দেবতার কাছে কি ধরনের গরু কোরবানী দিতে হবে তাও বিধি বদ্ধ করা হয়েছে। *বিষ্ণুর জন্য ছোট ষাড়, ইন্দ্রের জন্যে বাঁকা শিংযুক্ত বলদ, পূষনের জন্যে কালো গরু এবং রুদ্রের জন্যে লাল গরু কোরবানী দেয়ার বিধান রয়েছে*। আবার শুক্ল যজুর্বেদের শেষাংশে আছে 'শতপথ ব্রাহ্মণ' এবং তারও শেষাংশে আছে 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ'। এই শতপথ ব্রাহ্মণ এর ৩/১/২/২১-এ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের অনুশাসন উল্লেখ করা হয়েছে যে '*হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যোশ্নাম্যেবাহমংসলং চেদ্ভতি*' অর্থাৎ '*গরুর মাংস যদি নরম হয় তবে খাওয়া যেতে পারে*'। আবার উপনিষদগুলোর মধ্যে অন্যতম বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬/৪/১৮ নং শ্লোকে বলা হয়েছে '*কোনো ব্যক্তি যদি এমন পুত্র লাভে ইচ্ছুক হন, যে পুত্র হবে প্রসিদ্ধ পন্ডিত, সভাসমিতিতে আদৃত, যার বক্তব্য শ্রুতিসুখকর, যে সর্ববেদে পারদর্শী এবং দীর্ঘায়ু, তবে তিনি যেন বাছুর অথবা বৃষের মাংসের সংগে ঘি দিয়ে ভাত রান্না করে নিজের স্ত্রীর সংগে আহার করেন (মাংসৌদনং পাচয়িত্বা... ঔক্ষেণ বার্ষভেণ বা)*।' অর্থাৎ, অন্যতম প্রধান উপনিষদ 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ'-এ বেদ সম্বন্ধে পারদর্শিতা অর্জনের শর্ত হিসেবে গরুর মাংস বিরিয়ানীর মতো রান্না করে খাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার হিন্দু আইনের উৎস মনু সংহিতার মনু হচ্ছেন কথিত দেবতা ব্রহ্মার সন্তান। মনুই হচ্ছেন প্রথম সৃষ্টি, অনেকটা আদম-হাওয়ার মতো। এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থানুসারে মনুর থেকে আমরা সৃষ্টি হয়েছি বলে আমাদের মানব বলা হয়। সেই মনুস্মৃতি ৫/৩৯-এ বলা হয়েছে

'*স্বয়ম্ভু ভগবান যজ্ঞে বলিদানের জন্যেই সব পশু সৃষ্টি করেছেন*, এবং একথাও বলা হয়েছে *৫/৩৫-এ কোনো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে যে ব্যক্তি মাংস খেতে অস্বীকার করে সে পরবর্তী একুশ জন্ম পশু হয়।*' তবে *যে সব প্রাণী এক ক্ষুর বিশিষ্ট, তাদের মাংস খাওয়া বিশেষ বিধান ছাড়া বারণ* (ঐ, ৫/১২)। আমরা সকলেই জানি এই শ্রেনীতে গরু পড়ে না। আবার *যেসব প্রাণীর একপাটি দাঁত আছে তাদের মাংস খাওয়া যেতে পারে* (ঐ, ৫/২০)। বলাবাহুল্য এই শ্রেনীতে গরু পড়ে। আবার মনুস্মৃতিতে (৫/২২, ৯০/০৪-১০৮) বলা হয়েছে '*অতিথিদের খেতে দেবার জন্যে, পোষ্যদের প্রতিপালনের জন্যে, অথবা ক্ষুধা নিবৃত্তির প্রয়োজনে যে কোনো মাংসই বিধিসম্মত*।' বিষ্ণুপুরানে (৩/১৬) উল্লেখ আছে, *ব্রাহ্মণদের গোমাংস খাইয়ে হবিষ্য করালে পিতৃগণ এগারো মাস পর্যন্ত তৃপ্ত থাকেন*। শুধু এগুলোতেও না, বশিষ্ঠস্মৃতি(৪/৮), কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (২/২৯/১২৯, ২/২৬/১২২) বাল্মীকি রামায়ণ (২/৫৪), বেদব্যাসী মহাভারত (১২/২৬৬, ১৩/৬৬)-এ গরু মাংস খাওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। এখন তাহলে তোমরা বলো, হিন্দুধর্মগ্রন্থগুলোতে কি গরু মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ করা হইছে?'

সবাই দেখলাম চুপ হয়ে গেলো। মৃণাল প্রথমে বেশ আগ্রহভরে লিখতে ছিলো পরে লেখা থামিয়ে সামিনের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো, খেই হারিয়ে ফেলেছিলো বোধহয়। লক্ষ্যকরলাম বেশ অবাক সবাই।

মৃণাল তখন মিনমিন করে প্রশ্ন করলো, 'তাহলে আমরা কেন গরুমাংস খাই না?'

সামিন বললো- 'আসলে খাওয়ার অভ্যাস উঠে গেছে ক্রমশ, তাই আর খাওয়া হয় না তোমাদের। প্রাচীন ভারতে বৈদিক যুগের আগে থেকেই গোমাংস ভক্ষন বহুল প্রচলিত ছিল এমন কি খ্রীষ্টাব্দ অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধেও গরু মাংস খাওয়া প্রচলিত ছিল মুনিঋষিদের মধ্যেও, এর প্রমান হচ্ছে ঐ সময়ে রচিত ভবভূতির 'উত্তররামরচিত' নাটক।....তবে ইতিহাস থেকে জানা যায়, একাদশ শতাব্দী থেকে এ অঞ্চলের তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে গরুর মাংস খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। বিখ্যাত বিদেশী পর্যটক আলবেরুণী ও এরকমই মত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, '*গরু এমন একটি প্রাণী যা মানুষের অনেক প্রয়োজনে আসে। গরু মাল বহন করে, কৃষিক্ষেত্রে হালচাষ এবং বীজ বপনে অপরিহার্য, দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য দিয়ে পরিবারের ভরণপোষন করে। গোবর অনেক ভাবে ব্যবহৃত হয়। শীতকালে এমনকি গরুর নিঃশ্বাসও মানুষের কাজে লাগে। এজন্যই গরুর মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ হয়েছে* ..... (Alberuni's India, tr. Edward C. Shachau, ed. and ab. Ainslee T. Embree, w.w. Norton, Newyork, !971, ch. LXVIII)।' মূলত গরুর মাংস খাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞার প্রধান কারণ ছিলো অর্থনৈতিক। এবং খাদ্যদ্রব্য হিসেবে তার মূল্যের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ধন বা ক্যাপিটাল হিসেবে অধিকতর মূল্যের স্বীকৃতির ইংগিত পাওয়া যেতে শুরু করে আনুমানিক খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে। সংযোজিত মহাভারত এর অনুশাসন পর্বে এর ইংগিত রয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে আর্থিক প্রয়োজনকে ধর্মীয় তত্ত্বের আবরণের আড়ালে ঢাকবার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছিলো। কারণ স্বর্গ নরকের লোভ বা ভয় না দেখালে (যা শাসকগোষ্ঠী ও তাঁর তল্পিবাহক পুরোহিতেরা যুগ যুগ ধরে করে আসছে।) গরুর মাংসের মত সহজপ্রাপ্য এবং পুষ্টিকর খাদ্যের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা সম্ভব ছিলো না একই সংগে এও দেখা যায় গরুর মাংস খাওয়ার অভ্যাস বহুল প্রচলিত ছিল, কারণ বেদব্যাসী মহাভারতের (১৩/৬৬) মতানুসারে 'নাস্তিক, পশুঘাতী এবং গোজীবী প্রভৃতি 'পাপাত্মাদের' গরু দান করতে নিষেধ করা হয়েছে।'....যা হোক তাহলে দেখা যাচ্ছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার ফলে কৃষিপ্রধান দেশে ধন হিশেবে গরুর মূল্য ক্রমশ এর খাদ্যমূল্যকে ছাড়িয়ে যেতে থাকে। যানবাহনের জন্যে, দুধ-ঘি-ছানা-মাখনের জন্যে, সারের জন্যে, জ্বালানি হিশেবে এবং ঘরদোর লেপাপোঁছার কাজে গোবরের ব্যবহারের জন্যে ধন বা পুঁজি হিশেবে গরুর আর্থিক মূল্য হয়ে দাঁড়াল গরুর মাংসের খাদ্যমূল্যের চেয়ে অনেক বেশী। যার ফলশ্রুতিতে ধীরে ধীরে গরুর অর্থনৈতিক উপকারিতার কারণে গরুকে কোরবানী দেয়ার পরিবর্তে পবিত্র জ্ঞান করা হতে থাকে। তবে বলা যায় হিন্দুদের গোহত্যার বিরুদ্ধে গড়ে উঠা প্রথায় শুধু মাত্র অর্থনৈতিক কারণ নয় কিছুটা

সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণও ছিল। যুক্তি হিসেবে বলা যায়, ভারত ইতিহাসের প্রাচীন যুগের শেষভাগ থেকে মধ্যযুগের প্রথমার্ধ পর্যন্ত এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম (কিছুটা জৈনধর্ম) ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে সবরকম প্রাণী হত্যা নিষিদ্ধ এবং সর্বজীবে অহিংসাকে শ্রেষ্ঠ নীতি হিসেবে গণ্য করা হয়। তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় এই ধরণের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে গিয়ে হিন্দু সমাজকে অনেক রকম আপোষ করতে হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখি বিষ্ণুর দশম অবতারের মধ্যে গৌতম বুদ্ধকেও একজন অবতার বানিয়ে দিলো তৎকালীন ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। কিন্তু পরবর্তীতে আরব, তুর্কী-আফগান বহিরাক্রমনের মধ্য দিয়ে বহিরাগত শাসকদের ধর্ম ইসলাম সর্বস্তরে প্রসারের ফলে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ থেকে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে হিন্দু সমাজের নিয়ন্তারা যা কিছু ইসলাম দ্বারা অনুমোদিত, তারই বিরোধিতা করতে থাকেন। গোমাংসের ভক্ষনের উপর নিষেধাজ্ঞা এবং এই বিধানের চারদিকে ধর্মীয় আবরণ সৃষ্টি এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিরও ফলশ্রুতি। তাই বলা যায়, আর্থিক কারণগুলির সংগে সংগে এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণগুলি ও যে গোহত্যা বন্ধে শক্তি যুগিয়েছিলো তা অস্বীকার করা যায় না। এরই মাধ্যমে আস্তে আস্তে গরু ক্রমশ মাতৃসম হয়ে দাঁড়ালো এবং এর মলমূত্র হয়ে গেলো হিন্দু ধর্মের উপকরণ।'

আমি তখন গলা বড় করে বললাম, 'বুঝলাতো এখন কেন, কিভাবে হিন্দু ধর্মে গরু মাংস খাওয়া উপর নিষেধাজ্ঞা আসলো?' সবাই দেখলাম ঝিম মেরে আছে। এই ফাঁকে আমি সামিনকে প্রশ্ন করলাম, 'আচ্ছা, অনেকেই দেখি হিন্দু ধর্মকে ধর্ম বলতে চান না, ধর্ম বলে মনে করেন না। কেউ কেউ হিন্দু সভ্যতা, কেউবা হিন্দু সংস্কৃতি বলেন, কেন?'

সামিন বললো, 'কারণ নিশ্চয়ই আছে। এক এক ঐতিহাসিক বা বুদ্ধিজীবি এক একভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাই তাদের মতভিন্নতা রয়েছে। তবে আমার মতামত আমি বলছি, অনেকেই হয়তো ভিন্নমত পোষন করতে পারেন। প্রথমে ধর্ম দিয়ে শুরু করা যাক। ধর্ম শব্দের অনেক অর্থ আছে, অনেক কিছু বোঝায়। 'ইসলাম' 'খ্রিষ্টান' 'বৌদ্ধ' 'হিন্দু' ধর্ম দ্বারা যে অর্থ বুঝি তাই কিন্তু ধর্মের একমাত্র, প্রকৃত বা গ্রহণযোগ্য সজ্ঞা না। এ ব্যাপারে তোমাদের অন্যদিন বলবো। তাই ইংরেজী 'রিলিজিয়ন (Religion)' শব্দের বিকল্প হিসেবে বাংলায় 'উপাসনা ধর্ম' শব্দটি ব্যবহার করতে পারি। এই 'উপাসনা ধর্ম' দ্বারা ইংরেজী 'রিলিজিয়ন' শব্দের ভাব ঠিক মতো প্রকাশ পায়। যাই হোক, এই সকল উপাসনা ধর্মের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট বা লক্ষণ রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, (১) মানুষের চেয়ে শক্তিশালী বা মহত্তর এক বা একাধিক শ্রেণীতে বিশ্বাস, (২) এই শক্তি বা শক্তিগুলিকে শ্রদ্ধা করা, ভয় করা, প্রার্থনা করা ও তার জন্যে উৎসর্গ করা, (৩) এই প্রার্থনা, উৎসর্গ ইত্যাদির জন্যে অনুষ্ঠান করা, (৪) কয়েকটি বিশেষস্থানকে পূজাস্থল হিসেবে গণ্য করা, (৫) ধর্মাচরণ করে পৃথিবীতে বা মৃত্যুর পরে উন্নতর জীবন অর্জন করা সম্পর্কিত বিশ্বাস, (৬) শক্তিগুলিকে (দেবতা বা দেবতাদের) সন্তুষ্ট করার জন্যে উপযুক্ত আচার ব্যবহার করা। এখন বলতো, হিন্দু উপাসনা ধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি, তা কি এই সকল বৈশিষ্টের মধ্যে পড়ে? এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা-য় হিন্দুধর্মের কয়েকটি সাধারণ লক্ষনের কথা বলা হয়েছে; যেমন- (১) আত্মন ও ব্রহ্মণের তত্ত্বে বিশ্বাস (২) ইষ্টদেবতা ও ত্রিমুর্তিতে (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) বিশ্বাস, (৩) বেদ-ব্রাহ্মণে বিশ্বাস, (ঘ) পুনর্জন্মে ও কর্মফলে বিশ্বাস। এখন বলতো এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার দেয়া হিন্দু ধর্মের সাধারণ লক্ষনগুলির সাথে উপাসনা ধর্মের লক্ষণগুলো কি মিল যাচ্ছে না? তবে হ্যাঁ, বলা যায় হিন্দু উপাসনা ধর্মের প্রাচীনত্বের কারণে অনেক পরস্পরবিরোধী আচার অনুষ্ঠান, নানা ধরনের বৈচিত্র, বিভেদ, বিভিন্নতার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যার কারণে অনেকেই একে 'ধর্ম' বা 'উপাসনা ধর্ম' বলতে চান না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইহুদি, খ্রিষ্টান, ইসলাম, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি উপাসনা ধর্মের মত 'হিন্দু উপাসনা ধর্ম' একক কোনো নেতৃত্ব থেকে সৃষ্টি হয় নাই, সৃষ্টির সময় থেকেই বহুজনের বহুরচনা, বহুমতামত, বিচিত্র ব্যাখ্যা হিন্দু উপাসনা ধর্মে স্থান পেয়েছে, যা অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর বিরোধী। আবার 'হিন্দু' নামটি ও এই উপাসনা ধর্মালম্বীদের দেয়া নাম নয়। অনেকের মতে ১৮৩০ সালে ইংরেজরা প্রথম 'হিন্দু' শব্দটি দ্বারা ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাসকারী বেশীর ভাগ

মানুষের পরিচয় দিতে শুরু করে এবং বিগত ২০০০ বছরেরও বেশী সময়ব্যাপী ভারতীয় সভ্যতাকে এই নামে অভিহত করা শুরু করে। হিন্দু শব্দটি এসেছে সিন্ধু নদীর নাম থেকে- সিন্ধু নদীর তীরবর্তী সভ্যতা তথা মনুষ্যগোষ্ঠীর নাম হিসেবে। আবার অনেকে 'হিন্দু' কথাটির উৎস হিসেবে ফার্সি 'হিন্দ্' শব্দটির কথা উল্লেখ করে থাকেন। প্রাচীন মুসলিম আরবী ও ফার্সি সাহিত্যে 'সিন্দ্ হিন্দ্' দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানের আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান ও সিন্ধুপ্রদেশ 'সিন্দ্ দেশ' নামে এবং তার পূর্বদিকের অঞ্চলকে অর্থাৎ বর্তমান ভারত ভূখন্ডকে 'হিন্দ্ দেশ' নামে অভিহিত করা হতো। 'হিন্দু' নাম করণটির উৎস যাহোক না কেন, এই সকল নানা কারণেই বর্তমানে অনেকেই 'হিন্দু উপাসনা ধর্ম' কে 'হিন্দু সভ্যতা' 'হিন্দু সংস্কৃতি'কে এক করে দেখেন।' আমি বললাম, 'হুঁ, বুঝলাম। যেমন করে আমার নামটি আনিন্দ্য থেকে আনু, আন্দু, আন্ডু-তে রুপান্তরিত হয়ে চলছে। ……'

বেশ ঘুম পাচ্ছে। আজকে এতো তাড়াতাড়ি যে পাচ্ছে। জানালাটি লাগিয়ে দেই, নাহলে মাঝ রাতে উঠে আবার লাগাতে হবে, ততক্ষনে ড্রাকুলাগুলো আমার কালো শরীরকে সাদা করে দিবে রক্তশুন্যতা ঘটিয়ে। ঘুম আয়, ঘুম আয়। ধ্যাৎ! এর মাঝে কে আবার মেসেজ পাঠালো। ওহ! সামিন দেখি পাঠিয়েছ। ……হা! হা! হা! দারুন মেসেজ। ' I have written a nice poem for you, Twinkle Twinkle little star.. u should know what u r...& once u know what u r....mental hospital is not so far....'

আহ! একটা প্রশান্তি লাগতাছে সারা শরীরে! ঘুম হবে দারুন। বিদায় রজনী আজকের মতো। বিদায়।

……চলতে পারে ……